Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-II, published on April 2023, Page No. 174– 179
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

অনিল ঘড়াইয়ের 'নুনবাড়ি' : এক নিম্নবর্গীয় নারীর জীবন সংগ্রাম

গোবিন্দ রায়
গবেষক, বাংলা বিভাগ
রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল : gobindagadong@rediffmail.com

Keyword
নিম্নবর্গ,, অনিল ঘড়াই, বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গ, নুনবাড়ি, নিম্নবর্গীয় নারী, জীবন সংগ্রাম।

Abstract
নিম্নবর্গ শব্দটি ইতালীয় কমিউনিস্ট নেতা ও দার্শনিক আন্তোনিও গ্রামশি ব্যবহৃত 'Subaltern'-এর বাংলা প্রতিশব্দ বলে ধরা হয়। 'Subaltern Studies' এর অন্যতম পথিকৃৎ রণজিৎ গুহ 'নিম্নবর্গের ইতিহাস' শীর্ষক আলোচনায় এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তিনি সেখানে ভারতীয় প্রেক্ষিতে ও তার জনসংখ্যাতত্ত্বের নিরিখে দুটি বর্গের উল্লেখ করেছেন। একটি উচ্চবর্গ, অন্যটি নিম্নবর্গ। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে সমগ্র জনসংখ্যা থেকে এই উচ্চবর্গকে বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তারাই নিম্নবর্গ। যে শৃঙ্খল সার্বিকভাবে তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেই শৃঙ্খল থেকে মুক্তিলাভই হচ্ছে নিম্নবর্গীয় চেতনাবাদের মূল কথা।

বাংলা ভাষা ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠীর শ্রেণিবিন্যাস ও সমাজ কাঠামো, উৎপাদন বৈচিত্র্য, অর্থনৈতিক অবস্থানের বিভিন্নতায় বাংলা উপন্যাসের বিষয় হিসেবে স্বাভাবিক ভাবে উঠে এসেছে নিম্নবর্গ মানুষের জীবন সংগ্রাম ও সমাজ-সংস্কৃতির রূপ বৈচিত্র্য। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের চর্যাপদ থেকে শুরু করে মধ্যযুগের ভিতর দিয়ে আধুনিক সাহিত্যের অঙ্গনে শবর, চণ্ডাল, মুচি, ডোম, জেলে, ভিক্ষুক, মাঝি প্রভৃতি নানা বর্ণ-ধর্ম-কর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়। যদিও প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্য ছিল মূলত কাব্যসাহিত্য।

বাংলা কথাসাহিত্যে অনিল ঘড়াই অতি পরিচিত নাম। তাঁর জন্ম ১৯৫৭ সালের ১ নভেম্বর পূর্ব মেদিনীপুরের এগরা থানার অন্তর্গত রুক্মিণীপুর গ্রামের একটি নিম্নবর্গীয় সমাজের পরিমণ্ডলে। অনিল ঘড়াই-এর শতাধিক গল্প ও কুড়িটির বেশি উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে বিবৃত হয়েছে দলিত ও অন্ত্যজ জীবনের ইতিহাস।

অনিল ঘড়াই-এর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'নুনবাড়ি' (১৯৯১)। ঔপন্যাসিক অনিল ঘড়াই 'নুনবাড়ি' উপন্যাসে মেদিনীপুরের নুনমারা সম্প্রদায়ের একটি পরিবারের জীবন সংগ্রামকে উপন্যাসে রূপ দিতে গিয়ে গোটা একটা সমাজকে তুলে ধরেছেন, যে সমাজে সাধারণ মানুষদের জীবিকা হল – খেয়া বাওয়া, কবিয়াল, ডাকাতি, নুন তৈরি, চা বিক্রি, বেশ্যাবৃত্তি, যাত্রাগান, যাত্রাদলে বাঁশি বাজানো প্রভৃতি। যাদের সঠিকভাবে খাবার জোটে না, দু-বেলা পান্তভাত খেয়ে জীবন কাটাতে হয়। বিয়ের পর বেশিরভাগ মেয়েকে মদো-মাতাল স্বামীর অত্যাচারে বিতাড়িত হতে হয়। এরূপ

একটিসমাজব্যবস্থাকে এই উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে খুঁজে পাওয়া যায়। স্বামীর ঘর ছেড়ে বাপের বাড়িতে থাকলেও সেখানে নানা পুরুষের প্রলোভনে পড়তে হয়, এমনকী গ্রাম প্রধানও স্বামী খেদানো মেয়ের প্রতি কুদৃষ্টি ও প্রলোভন দেয়। যে সমাজে মেয়েদের যৌনক্ষুধা মেটাতে গিয়ে পেট হয় এবং পাপ ঢাকতে পেট ধসাতে হয় এমন একটি পঙ্কিল সমাজে লবঙ্গ নামের একটি মেয়ের একক প্রচেষ্টায় সমাজের এহেন পঙ্কিল আবর্ত থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর কাহিনি এই উপন্যাস।

Discussion

১

নিম্নবর্গ শব্দটি ইতালীয় কমিউনিস্ট নেতা ও দার্শনিক আন্তেনি ও গ্রামসি ব্যবহৃত 'Subaltern'-এর বাংলা প্রতিশব্দ বলে ধরা হয়। যদিও গ্রামসি তাঁর 'কারাগার' নোটবইতে dominant-এর বিপরীত হিসেবে Subaltern শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। তবে সাধারণ ভাবে 'Subaltern'-এর অর্থ নিম্নস্থিত বা অধস্তন ধরা হয়। যে অধস্তনদের কোনদিন প্রভুশক্তির অভাব ঘটে না। অভাব ঘটে, ভালভাবে বেঁচে থাকার অধিকারে। প্রভু কারা? Subaltern Studies এর অন্যতম পথিকৃৎ রণজিৎ গুহ 'নিম্নবর্গের ইতিহাস' শীর্ষক আলোচনায় এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তিনি সেখানে ভারতীয় প্রেক্ষিতে ও তার জনসংখ্যাতত্ত্বের নিরিখে দুটি বর্গের উল্লেখ করেছেন। একটি উচ্চবর্গ, অন্যটি নিম্নবর্গ। তিনি উচ্চবর্গ বলতে বোঝাতে চেয়েছেন তাঁদের যাঁরা ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে প্রভুশক্তির অধিকারী ছিলেন। এই প্রভু স্থানীয়দের তিনি আবার দু'ভাগে ভাগ করেছেন এক, দেশী; দুই, বিদেশী। বিদেশী প্রভু শক্তির মধ্যে আবার দুটি ভাগ দেখিয়েছেন। সরকারী এবং বেসরকারী। সরকারী বলতে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের অভারতীয় কর্মচারী ও ভৃত্য সকলেই। আর বেসরকারী বলতে গণ্য বিদেশীদের মধ্যে যারা শিল্পপতি, অর্থব্যবসায়ী, খনির মালিক, জমিদার, নীলকুঠির মালিক, চা-বাগান, কফিখেতের মালিক ও কর্মচারী, খ্রিস্টান মিশনারী, যাজক ইত্যাদি। অন্যদিকে, দেশী প্রভুগোষ্ঠীর মধ্যেও দুটি ভাগ করা যায়। এক, সর্বভারতীয়, দুই, আঞ্চলিক। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বৃহত্তম সামন্ত প্রভু, আমলাতন্ত্রে যারা উচ্চপদের অধিকারী। আর দেশী প্রভুগোষ্ঠীর আঞ্চলিক প্রতিনিধি হল ধনী কৃষক, কিছুটা নিঃস্ব ভূস্বামী।[১] সুতরাং, ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে সমগ্র জনসংখ্যা থেকে এই উচ্চবর্গকে বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তারাই নিম্নবর্গ। রণজিৎ গুহ সেই সঙ্গে আরও বলেছেন— আমাদের ইতিহাস চিন্তায় এখনও প্রায় অনুপস্থিত সেই আদিবাসী, নিম্নবর্গ ও নারীদের ভূমিকা নিয়ে বিশেষ করে ভাবতে ও লিখতে হবে।[২] তাদেরও যে নিজস্ব অনুভূতি আছে, চেতনাময় অবস্থান আছে, নিজস্ব নন্দনতত্ত্ব আছে তা উচ্চবর্ণীয় আধিপত্যবাদী পুরুষেরা অস্বীকার করে। তাদের কাছে নিম্নবর্গীয় মানুষেরা পরাক্রান্ত, প্রান্তকায়িত, অন্তেবাসী। তাদের কাজই হচ্ছে যেন ছায়াঞ্চলে থাকা। তবে তারা কী চিরকালই ছায়াঞ্চলে থেকে যাবে? যে শৃঙ্খল সার্বিকভাবে তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেই শৃঙ্খল থেকে মুক্তিলাভই হচ্ছে নিম্নবর্গীয় চেতনাবাদের মূল কথা।

২

আশির দশক থেকে নিম্নবর্গদের নিয়ে বিশেষ আলোচনার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে রণজিৎ গুহ ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের 'নিম্নবর্গের ইতিহাস' প্রকাশ্যে আসার পর নিম্নবর্গদের নিয়ে নতুন করে ভাবনাচিন্তা শুরু হয়। নিম্নবর্গীয়ের নিপীড়নের ইতিহাস কোনো ইতিহাস গ্রন্থে পাওয়া কঠিন। আর ইতিহাস সবসময় নিরপেক্ষতা বজায় রাখতেও পারেনি। সেখানেও অনাদর, অবহেলা। সহজ ভাষায় বলা যায় পরাক্রমশালী ব্রাহ্মণ্যবাদের আধিপত্য। স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের প্রজা সাধারণের খোঁজ নিতে দ্বারস্থ হতে হয় সাহিত্যের পাতায়। সাহিত্যিক যে সত্যদ্রষ্টা। সমাজের যা কিছু অসঙ্গতি তা তাঁর কলমে উঠে আসে। সেদিক থেকে আমাদের বাংলা সাহিত্যে প্রথম বর্ণীয় আধিপত্যবাদের খবর পাওয়া যায় চর্যাপদে –

"নগর বাহিরেঁ ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাহ সো ব্রাহ্ম নাড়িআ।"

এর মধ্য দিয়ে আমরা যতই সাধন-ভজন তত্ত্বের কথা বলি না কেন বাস্তব সত্য কিন্তু অন্য কথাই বলে। এবং তা যে কতটা অপমানকর তা পাঠক মাত্রেই অবগত।

বাংলা ভাষা ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠীর শ্রেণিবিন্যাস ও সমাজ কাঠামো, উৎপাদন বৈচিত্র্য, অর্থনৈতিক অবস্থানের বিভিন্নতায় বাংলা উপন্যাসের বিষয় হিসেবে স্বাভাবিক ভাবে উঠে এসেছে নিম্নবর্গ মানুষের জীবন সংগ্রাম ও সমাজ-সংস্কৃতির রূপ বৈচিত্র্য। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের চর্যাপদ থেকে শুরু করে মধ্যযুগের ভিতর দিয়ে আধুনিক সাহিত্যের অঙ্গনে শবর, চণ্ডাল, মুচি, ডোম, জেলে, ভিক্ষুক, মাঝি প্রভৃতি নানা বর্ণ-ধর্ম-কর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়। যদিও প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্য ছিল মূলত কাব্যসাহিত্য। পরবর্তীকালে একেবারে আধুনিক যুগে কথাসাহিত্য সৃষ্টির ঊষালগ্ন থেকে নিম্নবর্গীয় মানুষের সমাজ ও জীবনের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্যারীচাদ মিত্রের (১৮১৪-১৮৮৩) 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮)-এর কাহিনি থেকে শুরু করে বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৮-১৮৯৪) অনেকগুলি উপন্যাসে নিম্নবর্গীয় নারী চরিত্র দেখতে পাওয়া যায়। যেমন— 'ইন্দিরা' (১৮৭৩), 'রজনী' (১৮৭৭), 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩) ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮) উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলি নিম্নবর্গের অন্তর্গত। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) হলেন দরিদ্র-নিপীড়িত-অসহায় মানুষের কথাকার। তিনি সহজ সরল ভাষায় সমাজের একেবারে নিচুতলার সাধারণ মানুষের দুঃখ যন্ত্রণাকে সহমর্মিতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন তাঁর রচনায়। তাঁর উপন্যাসে অসহায় নারী জাতির মর্মবেদনা পাঠক সমাজে স্বাতন্ত্র্য মূল্য অর্জন করেছে। শরৎচন্দ্রের নারীরাও নিম্নবর্গের অন্তর্গত। যেমন— 'শ্রীকান্ত' (১ম খণ্ড ১৯১৭, ২য় খণ্ড-১৯১৮, ৩য় খণ্ড-১৯২৭, ৪র্থ খণ্ড-১৯৩৩), 'চরিত্রহীন' (১৯১৭), 'গৃহদাহ' (১৯২০) প্রভৃতি উপন্যাসে নারীর নিরাশ্রয়তা, নিঃসঙ্গতা বাস্তবতার সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) সৃষ্টি সম্ভারেও উঠে এসেছে নিম্নবর্গ মানুষের জীবনকথা। মহাকাব্যিক উপন্যাস 'গোরা' (১৯১০)-তে আছে মুসলমান ও ব্রাত্য মানুষের কথা। এক বৃদ্ধ নাপিত একজন মুসলমান ছেলেকে মানুষ করেছে, যেখানে হিন্দু ও মুসলিম একসঙ্গে পাশাপাশি অবস্থান করছে। 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬) উপন্যাসেও নমঃশূদ্রদের কথা ফুটে উঠেছে। 'চোখের বালি' (১৯০৩) উপন্যাসে বিধবা বিনোদিনীর মাধ্যমে নিরাশ্রয় নারীর নিম্নবর্গত্বকে স্পষ্ট করে। রবীন্দ্রনাথও নিম্নবর্গ সমাজের মানুষগুলিকে কোনোভাবে এড়িয়ে যাননি বরং সাম্যের জয়গান গাইতে চেয়েছেন উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের সহাবস্থানের মাধ্যমে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৪-১৯৫০) 'পথের পাঁচালি' (১৯২৯), 'অপরাজিত' (১৯৩২) উপন্যাসে গ্রামীণ নিম্নবর্গ সাধারণ মানুষদের চোখে পড়ে। 'আরণ্যক' (১৯৩৮) উপন্যাসে দবরুপান্না, ভানুমতীর মতো বন্য আদিবাসী মানুষের বেঁচে থাকার কঠোর সংগ্রাম আমাদের বিস্মিত করে।

কল্লোল যুগ থেকে বাংলা উপন্যাসের ধারায় সচেতন ভাবে উঠে এসেছে নিম্নবর্গীয় দলিত-প্রান্তিক ভূমিপুত্রদের সমাজ ইতিহাস। আশির দশক থেকে কিছু সাহিত্যিক গোষ্ঠী সমাজের একেবারে গোড়ায় গিয়ে শেকড়ের সন্ধানে ব্রতী হন। সেই সকল সাহিত্যিকদের রচনায় বেশি করে স্থান পেয়েছে নিম্নবিত্ত- অন্ত্যজ, দলিত-অসহায় গ্রাম্য মানুষের চলমান জীবন-যন্ত্রণা, ভাষা, সংস্কৃতি, প্রেম-ভালোবাসা, খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, নিজেদের অধিকার আদায়ের দাবি। তাই আশির দশক থেকে নিম্নবর্গের প্রতি সাহিত্যিকদের একপ্রকার পক্ষপাতিত্ব লক্ষ করা যায়। বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকের শক্তিমান কথাসাহিত্যিকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন— মহাশ্বতা দেবী, ভগীরথ মিশ্র, সাধন চট্টোপাধ্যায়, অনিল ঘড়াই, অভিজিৎ সেন, নলিনী বেরা, সৈকত রক্ষিত, বিমল সিংহ, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর মিত্র, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, রামকুমার মুখোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, কালীপদ ঘটক প্রমুখ কথাসাহিত্যিকের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৩

বাংলা কথাসাহিত্যে অনিল ঘড়াই অতি পরিচিত নাম। বাংলা সাহিত্যে সৃষ্টির সম্ভারে তিনি বাংলা সাহিত্যের মোহরকুঞ্জে পবিত্র দেবভূমি সৃষ্টি করেছেন। সমাজে যারা ঘৃণ্য, অস্পৃশ্য, অশিক্ষিত, নিম্নবৃত্ত অসহায় মানুষ তাদের জীবনযাত্রা ও জীবন সংগ্রামকে বাংলা সাহিত্যে আন্তরিকতার সঙ্গে স্পষ্ট বক্তব্যে চিত্রিত করেছেন ঔপন্যাসিক অনিল ঘড়াই। তাঁর জন্ম ১৯৫৭ সালের ১ নভেম্বর পূর্ব মেদিনীপুরের এগরা থানার অন্তর্গত রুক্মিণীপুর গ্রামের একটি নিম্নবর্গীয় সমাজের

পরিমণ্ডলে। তাঁর জন্মভূমি ও সেই সমাজের জীবন দর্শনই পরবর্তী সাহিত্য জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। তিনি অন্যান্য সাহিত্যিকদের মতো নাগরিক সাহিত্য রচনায় আগ্রহী ছিলেন না। নিম্নবর্গীয় সমাজের দলিত-অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য খেটে খাওয়া মানুষের জীবন ও সমাজকে সাহিত্যে তুলে ধরেছেন। অনিল ঘড়াই-এর শতাধিক গল্প ও কুড়িটির বেশি উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে বিবৃত হয়েছে দলিত ও অন্ত্যজ জীবনের ইতিহাস। সমস্ত রচনাগুলিকে একত্রিত করলে নিম্নবর্গীয় মানুষের বৃহৎ জীবন ইতিহাসের রূপরেখা খুব সহজেই চোখে পড়ে।

অনিল ঘড়াই-এর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'নুনবাড়ি' (১৯৯১)। ঔপন্যাসিক অনিল ঘড়াই 'নুনবাড়ি' উপন্যাসে মেদিনীপুরের নুনমারা সম্প্রদায়ের একটি পরিবারের জীবন সংগ্রামকে উপন্যাসে রূপ দিতে গিয়ে গোটা একটা সমাজকে তুলে ধরেছেন, যে সমাজে সাধারণ মানুষদের জীবিকা হল – খেয়া বাওয়া, কবিয়াল, ডাকাতি, নুন তৈরি, চা বিক্রি, বেশ্যাবৃত্তি, যাত্রাগান, যাত্রাদলে বাঁশি বাজানো প্রভৃতি। যাদের সঠিকভাবে খাবার জোটে না, দু-বেলা পান্তভাত খেয়ে জীবন কাটাতে হয়। বিয়ের পর বেশিরভাগ মেয়েকে মদো-মাতাল স্বামীর অত্যাচারে বিতাড়িত হতে হয়। এরূপ একটি সমাজব্যবস্থাকে এই উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে খুঁজে পাওয়া যায়। স্বামীর ঘর ছেড়ে বাপের বাড়িতে থাকলেও সেখানে নানা পুরুষের প্রলোভনে পড়তে হয়, এমনকী গ্রাম প্রধানও স্বামী খেদানো মেয়ের প্রতি কুদৃষ্টি ও প্রলোভন দেয়। যে সমাজে মেয়েদের যৌনক্ষুধা মেটাতে গিয়ে পেট হয় এবং পাপ ঢাকতে পেট ধসাতে হয় এমন একটি পঙ্কিল সমাজে লবঙ্গ নামের একটি মেয়ের একক প্রচেষ্টায় সমাজের এহেন পঙ্কিল আবর্ত থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর কাহিনি এই উপন্যাস।

নুনবাড়ি উপন্যাসের শুরুতে ধ্বংস, শেষে সৃষ্টি, শুরুতে সর্বনাশের ইঙ্গিত, ভাঙা ঘরের ছবি, চোখের লহুতে নারীর অব্যক্ত যন্ত্রণা। শেষে নতুন দিনের আলো, নতুন প্রজন্মের হাত ধরে আগামীর দিকে দৃষ্টিবদ্ধ করে বেঁচে ওঠার স্বপ্নময় ছবি। আর গোটাটায় আছে সংগ্রাম। অস্তিত্বের জন্য বেঁচে থাকার জন্য লড়াই। নুনমারা সম্প্রদায়ের একটি অবহেলিত নিম্ন সমাজের মেয়ের ঘুরে দাঁড়ানোর কাহিনী। এর গল্পাংশে নুন মারা মলঙ্গী সমাজের জীবন চিত্র থাকলেও এ উপন্যাস চিরন্তন প্রেমকথা।

> "বুক ভেঙে গেলে মুখেও তার ছায়া পড়ে। সেই ছায়া শকুনের ধূসর ডানার চেয়েও ধূসর। লবঙ্গ তিনটে মাঠ পেরিয়েই ফেলে আসা গাঁ খানার দিকে ধড়াস বুকে তাকাল : অমনি নিঃশব্দে ভেতরে ধুলো হয়ে গেল মন। ভয়টা এখন ত যায় নি, পা ছাপিয়ে ধুলো ছোঁওয়া আটপৌরে শাড়ির মতো জড়িয়ে আছে। তার ঘরের মানুষ কালাচাঁদ এখন পরের মানুষ। গঞ্জের হাটে সুন্দরী রাঁড় রেখেছে সে। যা কামায় তার সবই নৈবেদ্য যায় চাল কারবারীর মেয়ের পায়ের তলায়। ... লবঙ্গ মানিয়ে নিতে চেয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারল না।"[৩]

এখানেই শুরু নুনবাড়ির। এ উপন্যাস নায়িকা প্রধান। লবঙ্গই এ উপন্যাসের প্রথম ও শেষ কথা, আর নুন। নারী নুন এখানে একাকার। জীবনানন্দ শুনিয়েছিলেন নোনা মেয়েমানুষের কথা। আর এ উপন্যাসে লবঙ্গ সমাজ সংসার মেনে স্বামী কালাচাঁদকে নিয়ে সুখী হতে চেয়েছিল। আর পাঁচটা সাধারণ নারীর মত রমনী মন নিয়ে। কিন্তু তার স্বামীর মন আটকে আছে শ্বাশুড়ির প্ররোচনায় অন্যত্র। তাই রোজ রাতে শরীরী সম্পর্ক চুকে গেলে গায়ের ঘাম শুকাতে খোঁটা দিত কালাচাঁদ। তার কালমুখ সহ্য করাই দায় হয় তখন। বুঝিয়ে সুঝিয়েও কোনো ফল হয় না।

> "পাগলা ষাঁড় গাভীর কোন দুঃখ বোঝে না। তার শুধু গুঁতিয়েই সুখ। কালাচাদ ষাঁড়ের গোঁ নিয়ে দিন কাটাত। পোষ্টকার্ড এনে ব্যাজার মুখে প্রায়ই বলত, তোর বাবাকে লিখ, সে এসে তোকে নিয়ে যাক।"[৪]

লবঙ্গ তার আদরের বাচ্চা ছেলে নোনাইকে নিয়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিল কালাচাঁদের অত্যাচার ছেড়ে বাপ জটায়ুর ভিটেয়। মা মরা মেয়েকে বাপ যে সহজে মেনে নিতে পেরেছে, তা নয়, তবু না মেনেও কিবা উপায়। বাবার সংসারেও আর কেউ ছিল না। নোনাইকে বুকে জড়িয়ে বাপের বাড়ির পূর্বপুরুষের জীবিকা নুনমারাকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকতে চেয়েছে লবঙ্গ। যদিও এতটা নির্বিরোধ ও দ্বন্দ্বহীন হয়ে ওঠেনি জীবনের অস্তিত্ব লবঙ্গের কাছে। একদিকে স্বামী কালাচাঁদের স্মৃতি; যন্ত্রনাময়, অশ্লীল, অত্যাচারিত। অন্যদিকে ছেলেবেলার বন্ধু কণ্ঠিরামের প্রত্যাশাহীন নীরব ভালোবাসার সংঘাতে যখন সে শাখা সিঁদুরে কালাচাঁদের স্মৃতি নিয়ে বাঁচতে চেয়েছে তখনই তার বাপ জটায়ু তাকে নোনাখালের স্রোতের গহ্বরে ছুঁড়ে ফেলে ভয়ঙ্কর জীঘাংসাকে চরিতার্থ করতে চেয়েছে নানারকম সামাজিক মিশ্র প্রতিক্রিয়ায়। '... দুরারোগ্য ঘায়ের মতো মেয়েটাকে সে আর সহ্য করতে পারছে না'। আর তখনই নিজের পঙ্গু জীবনের মতো অসুস্থ

মন নিয়ে পা ফসকে তলিয়ে গেছে ঘুর্ণি ঢেউয়ের নোনাখালের স্রোতে। নিয়তির আশ্চর্য-পাকচক্রে, সেই শিকারের লক্ষ্য মেয়ে লবঙ্গই উদ্ধার করেছে ভয়ঙ্কর স্রোতমৃত্যু থেকে জন্মদাত্রী পিতাকে।

> "... নিমেষের মধ্যে জ্যোৎস্নায় আলোকিত খালধারে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে দেয় তার পরণের শাড়ি। হাঁটু ডোবা জলে দাঁড়িয়ে প্রসব বেদনায় কাতর কোনো মায়ের গলা কঁকিয়ে উঠে বাবা গো, শাড়িটা ভালো করে ধরো দিনি, আমি তোমায় ঠিক টেনে তুলব।"[৫]

শেষ পর্যন্ত টেনেই তুলেছিল সে। আসলে এই প্রত্যয় ও প্রতিশ্রুতি লবঙ্গর মতো দারিদ্রশাসিত নিম্নবিত্তের নারীকেও জিতিয়ে দিয়েছিল শেষপর্যন্ত। আকণ্ঠ কণ্ঠগ্রস্থ মৃত্যুর বুকে ঝাঁপ দিয়ে মরণের বিরুদ্ধ সংগ্রামে।

সোনাখালের পাড়ের নুনমাটি চেঁছে, মাটির নুনবাড়িতে পাতন পদ্ধতিতে নুনজল গড়িয়ে, তা আগুনে মেরে নুন তৈরি করেছিল শরীরের রক্ত থেকে নুনজল ছেঁকে। শেষপর্যন্ত বাপ জটায়ুর সাহস ও বন্ধু কঠিরামের সঙ্গদান তাকে এই কঠিন জীবনের পথে চলতে সাহস জুগিয়েছে। কালাচাঁদ তাকে কোনোদিন ফিরে নেয়নি তার আপন ঘরে বরং ছিনিয়ে নিয়েছে তার শেষ সম্বল বাঁচার আশা ও স্বপ্ন নোনাইকে। হয়তো সেটাও একধরনের মুক্তি ছিল, যে বন্ধনহীনতার ভেতর দিয়ে সে দ্বিধাহীনভাবে কণ্ঠিরামের কাছে যেতে পেরেছে। কিন্তু তারও আগে কঠোর জীবন সংগ্রামে নুন ও নুনবাড়িতে লবঙ্গ এক করে নিয়েছে নিজের জীবনের সৃজন যন্ত্রনার সঙ্গে।

> "যদি মাটি নুন না চায় তাহলে নুনের কি সাধ্য মাটিতে গিয়ে মেশে। মাটিকেই তাই সবার প্রথমে এগিয়ে আসতে হয়। যদি কোন কারণে উভয় পক্ষই এগিয়ে আসে তাহলে তো সোনায় সোহাগা। মাটিতে নুন মিশে যাবার সময় নিজেকে আর সংযত রাখতে পারে না। এই একটা দোষের জন্য নুনের এমন স্বৈরিণী স্বভাব, নিজেকে সম্পূর্ণ বিকিয়ে দিয়ে সে কি মাটির মন পায়? এ বিরাট জটিল প্রশ্ন। লবঙ্গ কিছুতেই ঠাওরাতে পারে না। তখন দুই শরীরের নোনা জলের কোনো আলাদা বিশেষত্ব ছিল না। তবু তাকে মাটি ছেড়ে পালিয়ে আসতে হল।"[৬]

এই প্রত্যাখানের বিপরীতে নুনবাড়ির অদূরের কলাঝাড় থেকে উঠে আসা কণ্ঠিরামের প্রেম: ঘন নিঃশ্বাস সজীব রসাল করে রাখে লবঙ্গকে।

মলঙ্গীদের হাতে তৈরি নুনে কসরৎ অনেক। মেহনত অগাধ। শরীরকে মাটির সঙ্গে মাটি না করলে নুনজল থেকে নুন তৈরি করা যায় না। কঠোর শ্রমে শরীর রোদে আগুনে সেঁকে যত কালো হয়, নুন তত ধপধপে দুধ সাদা হয়। নুনের কারবারির কাছে বেশি দামে বিকোয়। নুন আর নারীর আশ্চর্য যুগলবন্দী এ উপন্যাস –

> "নুনবাড়ি থেকে নুনজল পড়ছে টুপটাপ। পেতে রাখা মাটির কলসিতে সেই জল পড়ার মোহময় শব্দ। এই শব্দের সঙ্গে যেন তার বেঁচে থাকার শব্দের হুবহু মিল। ঘোলা জলের দিকে তাকিয়ে চোখ ঝাপসা হয়ে আসে লবঙ্গের। খোলা চোখে সে দেখছে কলসি ভরছে। হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ ফোটায় এক সময় কলসীটা কানায় কানায় ভরে ওঠে। হয়তো উথলেও পড়বে। কিন্তু তার কি হবে? অশৌচ, কলসির মত ফাঁকা এই দেহটা নিয়ে সে আর কতকাল একলা হাঁটবে? যদি খালের জল পড়বে। পড়ে গিয়ে নোনাজলে ভরে যায় তাহলে।"[৭]

লবঙ্গ এ উপন্যাসের প্রধান নায়িকা। তার জীবনের দৈনন্দিনতায় নুন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। এ-উপন্যাসে নুন ও নারী এক হয়ে গেছে লেখকের অদ্ভুত এবং আশ্চর্য বর্ণনা কৌশলে আর জীবনকে কাছ থেকে দেখার আন্তরিকতায়।

এই নারী উপাখ্যানের পরিপূর্ণতা কণ্ঠিরাম ও লবঙ্গর সম্মিলনে যে নতুন শিশু জন্ম নেবে, তাকে ঘিরে নতুন নুনবাড়ির স্বপ্নে। কণ্ঠিরাম আর লবঙ্গ—

> "নোনাজলের হাবুডুবুতে বেশ কিছুটা জল খেয়ে তারা দুজনে যখন ডাঙ্গা ছুল তখন কানায় কানায় ভরে গিয়েছে নোনাখাল। ডাঙার উপর উঠেই হাত পা এলিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে লবঙ্গ।কণ্ঠিরাম ঝুঁকে পড়ে শুধায়, দেখো তো বেঁচে আছে কিনা ছেলেটা। যা নুনজল খেয়েচে,জন্মালে ও আমাদের নুনবাড়ি সামলাবে। ভবিষ্যৎ সুখের কথা ভেবে চকচকিয়ে ওঠে লবঙ্গের চোখ। কণ্ঠিরামের হাতটা নিয়ে তলপেটে রেখে বলে, দেখো তো খুঁজে পাও কিনা নুনবাড়ি। আগামী প্রজন্মের নুনবাড়িতে হাত রেখে কণ্ঠিরাম লবঙ্গের দিকে তাকায়। মৃদু চাপ দিয়ে সচকিত করে তোলে নোনতা একটা দেহ। তারপর, আকাশ খোলা দুই বুকের মাঝে কান পেতে সে শব্দ

> শোনে জোয়ারের। তার মনে হয় পৃথিবীর যাবতীয় নুনজল দিয়ে তৈরি হয়েছে এই দেহ, নারী দেহ। নোনাজলের নুনবাড়ি সুখবাড়ি।"[৮]

শুধু বাংলা ভাষা নয় পৃথিবীর যে কোনোভাষায় এ ধরনের উপন্যাস প্রথম। ইংরেজরা প্রথমে নুনের কারবারী হয়ে এদেশে এসেছিল –

> "যারা নুন মারত তাদের বলা হয় মলঙ্গী। মলঙ্গীরা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষ নন। হিজলী ও তমলুক অঞ্চলে যাঁরা সমুদ্র উপকূলে নোনা মাটি নিয়ে ষোড়শ শতাব্দী থেকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় লবন উৎপাদন করতেন তাদেরই বলা হত মলঙ্গী বা মলাঙ্গী। মোঘল আমলের বহু পূর্ব থেকেই এই অঞ্চলে মলঙ্গীরাই ছিলেন সুদক্ষ লবন শিল্পী। এঁদের মধ্যে কৈবর্ত (মাহিলা, ধীবর, নমঃশূদ্র, তেলী, কুম্ভকার, তন্তুবায়) এমন কি সাঁওতালগণও ছিলেন।"[৯]

নুনমারার সমস্ত পদ্ধতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় ভরা এ উপন্যাস। বাংলাদেশের নিম্নবর্গের সমাজের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য নারীপ্রধান, মাতৃতান্ত্রিকতার ছবি থাকলেও একালের বাংলার পঞ্চায়েত শাসিত পুরুষ শোষণ ব্যবস্থা সাধারণের স্তরে নামিয়ে এনেছে। লবঙ্গর কঠোর জীবনসংগ্রামের পাশাপাশি কণ্ঠিরাম একই জীবিকায় থেকেও শেষ পর্যন্ত কেন 'ফুলোট বাঁশি নিয়ে গাঁ ছেড়েছে কণ্ঠিরাম' তার সদুত্তর পাওয়া যায় না। লবঙ্গর জীবনসংগ্রাম তিতাসের বাসন্তীর জীবন সংগ্রামের মতো সমগ্র পৃথিবীর নারী সংগ্রামের প্রতীক হয়ে উঠেছে। লবঙ্গ কণ্ঠিরামের নতুন জীবন পাতার স্বপ্নের একটি নরম সবুজ প্রেমের গল্প লিখতে চেয়েছেন হয়তো অনিল ঘড়াই তাঁর প্রথম উপন্যাসে এবং সে চেষ্টায় তিনি সফল।

তথ্যসূত্র :

১. ভদ্র, গৌতম; চট্টোপাধ্যায়, পার্থ(সম্পা.), নিম্নবর্গের ইতিহাস, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা – ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ, এপ্রিল ১৯৯৮, নবম মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৮, পৃ. ৩২ - ৩৩
২. তদেব, পৃ. ৩৯
৩. ঘড়াই, অনিল, নুনবাড়ি, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৩৯৬, প্রথম দে'জ সংস্করণ – এপ্রিল ২০১৬, পৃ. ৯
৪. তদেব, পৃ. ১০
৫ তদেব, পৃ. ৩৭
৬. তদেব, পৃ. ৮৩
৭. তদেব, পৃ. ৮৫
৮. তদেব, পৃ. ১৩৬
৯. বুড়ো, মালি, মালঙ্গী বিদ্রোহের ইতিহাস, বৃন্দবাক, কলকাতা, পৃ. ৭৩